

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 738 - 743

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

বাংলা ব্যাকরণ চর্চার প্রারম্ভিক পর্ব ও পাঁচ বৈয়াকরণ

কুন্তল কুণ্ডু

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

উদয়নারায়ণপুর মাধবীলতা মহাবিদ্যালয়

Email ID: kuntalkundu026@gmail.com 0009-0004-4067-7988

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword.

Grammar,
Affix,
Sentence,
Number,
Gender,
Person,
Verb,
Adjective.

Abstract

The initiation of Bengali grammatical studies was driven by colonial imperatives and began under the aegis of foreign scholars. The credit for composing the first Bengali grammar is generally attributed to the Portuguese priest Manuel da Assumpção. His work, *Vocabulário em idioma Bengalla e Portuguez dividido em duas partes*, written in Portuguese using the Roman script in 1734, was published in 1743 from Lisbon, the capital of Portugal. The work is divided into two parts: the first outlines various grammatical principles of the Bengali language, while the second contains a Bengali–Portuguese and Portuguese–Bengali glossary.

The second major grammatical work related to Bengali is *A Grammar of the Bengal Language*, also known as *Bodhprakāśam Śabdaśāstram*, authored by Nathaniel Brassey Halhed. Composed *firingginām upakārārtham* (for the benefit of Europeans), this grammar was intended primarily to enable employees of the East India Company to acquire proficiency in Bengali for commercial purposes. Written in 1778, the work is notable for being the first Bengali grammar to employ the Bengali script.

Another significant contribution to Bengali grammatical history is William Carey's *A Grammar of the Bengalee Language*, published in 1801. Alongside the works of Manuel and Halhed, Carey's grammar represents a distinct and influential phase in the development of Bengali grammatical studies. Subsequently, Rammohan Roy's *Gaurīya Vyākaraṇa* played an important role in shaping Bengali grammatical discourse; this work was published posthumously in 1833.

In 1850, Shyama Churn Sircar, with the objective of teaching Bengali grammar to English-proficient learners, authored *Introduction to the Bengalee Language, Adapted to Students Who Know English, in Two Parts. A Bengali version of this work was published in 1852 under the title Bangla Byākaraṇa*. The early phase of Bengali grammatical studies reveals a pronounced influence of Sanskrit and English grammatical traditions. From the eighteenth to the nineteenth century, both indigenous and foreign grammarians largely adopted either Latin–English grammatical models or the framework of

Sanskrit grammar. Although these works demonstrate a degree of analytical insight, they generally fail to move beyond inherited grammatical paradigms in order to identify and articulate the intrinsic rules and syntactic structures specific to the Bengali language.

Discussion

বঙ্গদেশে ব্যাকরণচর্চার ইতিহাস হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো। তবে সহস্রাব্দ-প্রাচীন সেসব ব্যাকরণ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ নয়, সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ। যেসব বাঙালি বৈয়াকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রণেতা, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন চন্দ্রগোমী, জিনেন্দ্রবুদ্ধি, মৈত্রেয়রক্ষিত, বোপদেব প্রমুখ। প্রাচীন বাংলাদেশে লক্ষ করা যায় সংস্কৃত ব্যাকরণের বিস্তৃতি ও ব্যস্তির দিকটিকে পরিহার করে সংক্ষিপ্ত ও সহজ-সরল সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনার প্রয়াস। সপ্তম শতকে রচিত সর্ববর্মার কাতন্ত্র ব্যাকরণ, ত্রয়োদশ শতকে রচিত বোপদেবের মুঞ্চবোধ ব্যাকরণ, কিংবা ক্রমদীপ্তরের সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের মতো সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণের প্রচলন বঙ্গদেশে ছিল। টোল বা চতুর্পাঠীর ছাত্ররা যাতে সহজে বুঝতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এসব ব্যাকরণ রচিত। বাংলা ব্যাকরণ রচনার বিষয়ে সর্বপ্রথম তৎপর হয়েছিলেন বিদেশীরা। এই তৎপরতা গ্রহণে প্রণোদনা জোগিয়েছিল ঔপনিবেশিক তাগিদ। সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যেই হোক, আর খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অভিপ্রায়েই হোক— বিদেশীদের প্রয়োজন ছিল এদেশের মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করার। বাংলা ভাষাটা না-শিখলে এবং ভাষাটা বলতে না-পারলে সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশাসনিক কাজকর্ম কিংবা বাঙালিদের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারকর্ম কোনওটাই ভালোভাবে সম্পাদন করা যাবে না। তাই ইউরোপ থেকে আগত বিদেশীরা চেষ্টা করেছিলেন বাংলা ভাষাটা শিখতে, বাংলা ভাষার ব্যাকরণকে রঙ করতে। এভাবেই ঔপনিবেশিক তাগিদ থেকে বিদেশীদের হাতে বাংলা ব্যাকরণ রচনার সূত্রপাত ঘটেছিল।

প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনার কৃতিত্ব পর্তুগিজ পাদ্রি মানোএল দ্য আসসুসামের। তাঁর ‘Vocabulario em idioma Bengalla e Portuguez dividido em duas partes’ পর্তুগিজ ভাষায়, রোমান হরফে ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত এবং ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে প্রকাশিত। মানোএলের গ্রন্থের দুটি ভাগ। প্রথম ভাগে রয়েছে বাংলা ভাষার ব্যাকরণগত বিভিন্ন সূত্র এবং দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে বাংলা-পর্তুগিজ ও পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ। মানোএলের এই গ্রন্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত হয়ে ‘পাদ্রি মানোএল-দ্য-আসসুসাম-রচিত বাঙ্গলা ব্যাকরণ’ নামে প্রকাশিত হয়েছে। ক্যাথলিক ধর্মের প্রসারই যে এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তা গ্রন্থের মুখবন্ধ পাঠে স্পষ্ট হয়ে যায়। মানোএলের গ্রন্থে প্রথমেই কর্তৃকারক, সম্বন্ধ, সম্প্রদান, কর্ম, সম্বোধন ও অপাদান কারকের আলাদা আলাদা ৬টি বিভক্তির আলোচনা আছে। পুংলিঙ্গের ক্ষেত্রে মানোএল ‘একটা পুরুষ’ এবং স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে ‘একটা স্ত্রী’ এমন শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন। ‘টা’ অনাদর ও বিস্তৃতি অর্থে এবং ‘টি’ আদর ও ক্ষুদ্রতা অর্থে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু মানোএলের গ্রন্থে ‘টি’ পুংলিঙ্গে এবং ‘টা’ স্ত্রীলিঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্গত কারণেই এমন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, তাহলে কী অষ্টাদশ শতকের বাংলা ভাষায় ‘টা’ এবং ‘টি’-র প্রয়োগের ক্ষেত্রে ‘কথঞ্চিৎ’ লিঙ্গগত পার্থক্য বিদ্যমান ছিল।’ কারকভেদে শব্দের রূপ কীভাবে বদলে যাচ্ছে তা মানোএল গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই গ্রন্থে কারকভেদে একবচনে শব্দরূপ পরিবর্তনের একটি দৃষ্টান্ত— কর্তৃকারকে ‘স্ত্রী’, সম্বন্ধে ‘স্ত্রীরে’, সম্প্রদানে ‘স্ত্রীরে’, কর্মে ‘স্ত্রীরে বা স্ত্রীকে’, সম্বোধনে ‘ও স্ত্রী’, অপাদানে ‘স্ত্রীতে’ এবং বহুবচনের কর্তৃকারকে ‘সিত্রীরা (= স্ত্রীরা)’। করণ কারক বা অধিকরণ কারকের কোনও বিভক্তির আলোচনা এখানে নেই। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ সাধারণত একই রূপবিশিষ্ট হয়। যেমন— ফরসা ছেলে, ফরসা মেয়ে বা চালাক লোক, চালাক মহিলা। এর ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে। যেমন— সুন্দর পুরুষ, সুন্দরী রমণী কিংবা বিদ্বান ব্যক্তি, বিদুষী নারী। মানোএল জানিয়েছেন, স্ত্রীলিঙ্গে বিশেষণের অন্তে অল্প কিছু ক্ষেত্রে ‘আ’-কার যুক্ত হওয়ার কথা। যেমন— ‘হিংসক পুরুষ’, ‘হিংসকা মাইয়া’। এই গ্রন্থে ব্যক্তিব্যচক ও নির্দেশব্যচক দুই প্রকার সর্বনামের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও ‘ব্যাক্য-যোজনা’ অংশে সংযোজক, প্রশ্নব্যচক এবং অংশবোধক সর্বনামের প্রসঙ্গ এসেছে। ‘ধাতুরূপ’ অংশে অস্তিব্যচক ক্রিয়ার প্রসঙ্গে বর্তমান কাল, অসমাপ্ত অতীত, সম্পন্ন অতীত, সামান্য অতীত, সুসমাপ্ত অতীত,

এবং ‘ত্ব’, ‘তা’-এর মতো সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রসঙ্গ দৃষ্টান্ত-সহ উল্লেখ করেছেন। সমাসকে তিনি চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। এরপর আলোচনা করেছেন নামবাচক ও সংখ্যাবাচক শব্দের পরে ‘টা’, ‘টি’ প্রভৃতির ব্যবহার সম্পর্কে। Pronoun বা সর্বনামের পরিবর্তে তিনি ‘প্রতিসংজ্ঞা’ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। সর্বনামের বিভিন্ন ধরন নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি পুরুষ অনুসারে সর্বনামের রূপের কীরকম পরিবর্তন ঘটে তাও রামমোহন উল্লেখ করেছেন। এরপর সংযোজিত হয়েছে যথাক্রমে গুণাত্মক বিশেষণ ও ক্রিয়াত্মক বিশেষণের আলোচনা। ক্রিয়াত্মক বিশেষণকে লেখক সাকর্মক ও অসাকর্মক এই দুভাগে ভাগ করেছেন। সাকর্মক ক্রিয়াকেও দুভাগে ভাগ করেছেন। যথা- কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্য। ক্রিয়াপদের বিকল্প হিসাবে তিনি মাঝেমাঝেই ‘আখ্যাতিক পদ’ শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে ক্রিয়ার তিনটি ধরন। যথা- নির্ধারণ প্রকার, সংযোজন প্রকার ও নিয়োজন প্রকার। এরপরে সন্নিবিষ্ট হয়েছে প্রশ্ন প্রকরণ ও নিয়মের ব্যভিচার সংক্রান্ত আলোচনা। তারপর ক্রমাঙ্কনে ক্রিয়াপক্ষে ক্রিয়াত্মক বিশেষণ, বিশেষণীয় বিশেষণ, সম্বন্ধীয় বিশেষণ, সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ, অন্তর্ভাব বিশেষণ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা। পরিশেষে রয়েছে ছন্দ-সংক্রান্ত আলোচনা। পয়ার ছন্দ, ত্রিপদী ছন্দ এবং তোটক ছন্দ— এই তিন প্রকার ছন্দের প্রসঙ্গ তাঁর এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে শ্যামাচরণ সরকার ইংরেজি জানা শিক্ষার্থীদের বাংলা ব্যাকরণ শেখাবার আকাঙ্ক্ষায় 'INTRODUCTION/ TO THE/ BENGALIEE LANGUAGE,/ ADAPTED TO/ STUDENTS WHO KNOW ENGLISH,/ IN TWO PARTS' গ্রন্থটি রচনা করেন। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে ‘বাঙ্গলা-ব্যাকরণ’ নামে এ গ্রন্থের একটি বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তবে বাংলা সংস্করণটির লেখক-স্থানে শ্যামাচরণ সরকারের পরিবর্তে রয়েছে শ্রী শ্যামাচরণ শর্মা। এই ব্যাকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণ-সংক্রান্ত আলোচনা আছে। শ্যামাচরণ মোট ৪৯টি বর্ণের কথা বলেছেন, যার মধ্যে ১৬টি স্বর এবং ৩৩টি ব্যঞ্জন। বিভিন্ন ধ্বনির উচ্চারণ, অক্ষর সংযোগের নিয়ম, যুক্তাক্ষর ইত্যাদি বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে সন্ধি-র নানান সূত্রের আলোচনা। তিন ধরনের সন্ধির কথা এখানে বলা হয়েছে—

“...শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি বা প্রত্যয়ের যোগে, সমাস বিনা শব্দ বা পদদ্বয়ের যোগে, এবং সমাসে দুই বা অধিক শব্দের যোগে।”^৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদে শব্দ, লিঙ্গ, সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই তিনি শব্দ, পদ, বাক্য ইত্যাদির সংজ্ঞা দিয়েছেন। পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ— লেখক এই তিন প্রকার লিঙ্গের কথা বলেছেন এবং লিঙ্গ পরিবর্তনের বিভিন্ন সূত্রাদি উদাহরণ-সহ উল্লেখ করেছেন। বাংলা ভাষায় দ্বিবচনের অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করেছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে রয়েছে বিশেষণের আলোচনা। তাঁর মতে, বিশেষণ তিন প্রকার- গুণবাচক বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ ও বিশেষণীয় বিশেষণ। বাংলা বিশেষণের রূপ তিন ধরনের লিঙ্গের ক্ষেত্রেই একই রকম বলে তাঁর অভিমত। যেমন— ছোট বালক, ছোট বালিকা, ছোট ঘর। তিনি জানিয়েছেন, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত বিশেষণগুলির লিঙ্গভেদে রূপের পরিবর্তন হয়। যেমন- সুন্দর পুরুষ, সুন্দরী স্ত্রী। বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত বিশেষণের কখনও বহুবচন হয় না, কেবল বিশেষ্য শব্দের বহুবচন হয়। যেমন- উত্তম বালকগণ। কিন্তু বিশেষণের বিশেষ্য শব্দটি অপ্রকাশিত থাকলে সেই ক্ষেত্রে বিশেষণের সঙ্গেই বহুবচনের বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন- ধার্মিকেরা, পণ্ডিতেরা ইত্যাদি। ‘বিশেষণের সাধন’ অংশে শব্দ বা ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যয় বা বিশেষ্য কোনও শব্দ যুক্ত হয়ে কীভাবে বিশেষণ নিষ্পন্ন হয়, তার আলোচনা আছে। সংখ্যাবাচক বিশেষণ নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। ক্রিয়ার বিশেষণকে তিনি তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন- স্থান সম্বন্ধীয়, কাল সম্বন্ধীয় ও প্রকার সম্বন্ধীয়। পঞ্চম পরিচ্ছেদে সর্বনামের আলোচনা রয়েছে। লেখকের মতে বাংলা সর্বনামের আকার বা রূপ স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই এক, সর্বনাম যে-লিঙ্গবাচক শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, সেই লিঙ্গকেই স্মরণ করায়। পুরুষভেদে এবং বচনভেদে বিভিন্ন কারকের ক্ষেত্রে সর্বনামের রূপগত প্রকৃতি কীরকম হতে পারে সেই বিষয়েও লেখক এখানে আলোকপাত করেছেন। তখনকার সময়ে সাধুভাষায় ব্যবহৃত ‘অস্মদ’, ‘যুস্মদ’ ইত্যাদি সংস্কৃত সর্বনামের কথাও লেখক বলেছেন এবং প্রশ্নবোধক সর্বনাম ‘কে’ ও ‘কি’ নিয়েও আলোচনা করেছেন। উল্লেখ করেছেন ‘খোদ’-এর মতো পার্সি সর্বনামের প্রসঙ্গও। ‘মদীয়’, ‘স্বকীয়’, ‘স্বীয়’ ইত্যাদি বিশেষণীয় সর্বনামের আলোচনাও এখানে স্থান পেয়েছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের বিষয় ধাতু। ধাতুকে

আকারের দিক থেকে শ্যামাচরণ তিন ভাগে ভাগ করেছেন- অন ভাগান্ত, ওন ভাগান্ত এবং আন ভাগান্ত। কর্মের দিক থেকে ধাতুকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন- সক্রমক ও অক্রমক। তাঁর মতে ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার- ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান। ভূত কালের চারটি ভাগ। যথা- শুদ্ধ ভূত, বর্তমানসামীপ্য ভূত, অপূর্ণ ভূত এবং চিরভূত। মোট ৪১৪টি ধাতুর একটি বিস্তৃত তালিকাও তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সপ্তম পরিচ্ছেদে তিনি অব্যয়ের আলোচনা করেছেন। অব্যয় শব্দের মধ্যে তিনি কিছু ক্রিয়াবিশেষণ, সম্বন্ধসূচক অব্যয়, সমুচ্চার্যক শব্দ, অন্তর্ভাব প্রকাশক শব্দ, উপসর্গ, কোনও ভাবের আভাস প্রকাশক শব্দ, ভাষায় রীতি-ক্রমে ব্যবহৃত শব্দ এবং অনুকার শব্দকে স্থান দিয়েছেন। অষ্টম পরিচ্ছেদে তিনি বাংলা ভাষায় আটটি কারকের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা- কর্তৃকারক, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ ও সম্বোধন। এই পরিচ্ছেদেই পদবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। পদবিন্যাস বলতে তিনি বুঝিয়েছেন বাক্য রচনায় পদসমূহ স্থাপনের পারিপাট্য। পদবিন্যাসের বিভিন্ন নিয়ম সম্পর্কে আলোচনার পর তিনি অনুপ্রাস ও যমক অলংকার এবং যতি চিহ্নের সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তারপরে রয়েছে সমাসের আলোচনা। সমাসকে তিনি ছয় ভাগে ভাগ করেছেন, - দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি। নবম পরিচ্ছেদে ‘পদ্য’ শীর্ষক অংশে বিভিন্ন সংস্কৃত ও বাংলা ছন্দের আলোচনা রয়েছে। দশম পরিচ্ছেদের বিষয় বাংলা ভাষার চিহ্ন-সংক্রান্ত বিবরণ। একাদশ পরিচ্ছেদে ভিন্ন ভাষা থেকে বাংলাতে গৃহীত শব্দের ব্যবহার-বিষয়ক আলোচনা রয়েছে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদ তথা শেষ পরিচ্ছেদে স্থান পেয়েছে উপদেশমূলক বাক্যের আলোচনা।

বাংলা ব্যাকরণচর্চার প্রারম্ভিক পর্বে রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থগুলিতে সংস্কৃত বা ইংরেজি ব্যাকরণের কমবেশি ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। আঠারো থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত দেশি বা বিদেশি বৈয়াকরণেরা যাঁরা বাংলা ব্যাকরণ রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন, তাঁরা হয় ল্যাটিন বা ইংরেজি ব্যাকরণের আদর্শকে গ্রহণ করেছেন, নতুবা সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে বাংলা ব্যাকরণ লিখেছেন। এই সময়-পর্বের ব্যাকরণগুলিতে যে বিশ্লেষণী দৃষ্টির পরিচয় মেলে না এমন নয়। তবুও সংস্কৃত বা ইংরেজি ব্যাকরণের বর্ম ত্যাগ করে বাংলা ভাষার নিজস্ব নিয়ম ও বিন্যাস-প্রণালীকে খুঁজে দেখার চেষ্টা এ সমস্ত ব্যাকরণে সেভাবে লক্ষ করা যায় না। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উক্তি স্মর্তব্য—

“...সমস্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলিই দুই শ্রেণীর লোক কর্তৃক দুই প্যাটেণ্টে প্রস্তুত হইতেছে; একটি মুঞ্চবোধ-প্যাটেণ্ট গ্রন্থকার পণ্ডিতগণ, আর একটি হাইলি-প্যাটেণ্ট গ্রন্থকার মাস্টারগণ। এক প্যাটেণ্টের গ্রন্থ খুলিলেই বর্ণের উচ্চারণস্থান ও নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়; অপর প্যাটেণ্টের ব্যাকরণ খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, শব্দসমূহ পাঁচ ভাগে বিভক্ত— বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম ক্রিয়া ও অব্যয়। ক্রমে এক প্যাটেণ্টে সংস্কৃত সূত্রগুলির তর্জমা, আর এক প্যাটেণ্টে ইংরেজী রুলগুলির তর্জমা। বাঙ্গালাটা যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা, উহা যে পালি মাগধী অর্দ্ধমাগধী, সংস্কৃত পার্সি ইংরেজি প্রভৃতি নানা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, গ্রন্থকারগণ সে কথা একবারও ভাবেন না।”^৬

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, এবং প্রিয়রঞ্জন সেন, (সম্পাদিত), পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্‌সুপসাম-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩১, পৃষ্ঠা ‘প্রবেশক’ অংশ।
২. Halhed, Nathaniel Brassey, A Grammar of the Bengal Language, Hooghly, Printed by M DCC LXXVII, 1778, p. 68
৩. Carey, William, A Grammar of the Bengalee Language, 4th ed., Serampore, Mission Press, 1818, p. 5
৪. রায়, রামমোহন, গৌড়ীয় ব্যাকরণ, কলকাতা, কলকাতা স্কুলবুক সোসাইটি, ১৮৪৫, পৃ. ৫
৫. শর্মা, শ্যামাচরণ, বাঙ্গালা-ব্যাকরণ, কলকাতা, পি. এস. ডি. রোজারিও সাহেব, ১৮৫২, পৃ. ১৮
৬. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, ‘বাঙ্গালা ব্যাকরণ’, ড. বাঙলা ভাষা (প্রথম খণ্ড), হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদিত), ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৫, পৃ. ১২৭